Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 170 – 183
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে নারী-মনস্তত্ত্ব

সীমা সরকার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী
Email ID : Sima.rbuo5bng@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Women, Simone de Beauvoir; The second sex, deprived, half-human, half-fantasy, women-Psychology, complexities of women's mind. Eternal emotions of women, subconscious. Prominence.

Abstract
The position of women in Society became clear in French philosopher and essayist Simone de Beauvoir's famous Comment in 'The Second Sex' - 'No one is born a woman, but becomes a woman.' This woman is a wonderful Creation of God. Which has been viewed as an object for thousands of years Not as a person wheather tomorrow women have become known only object for as women—deprived of becoming human. To Rabindranath-women are 'half human' and half fantasy.' Also, according to various scholars, - women are incapable of becoming self-sufficient human beings In fact, as a result of the eviction of matriarchal Civilization and the development of feudal civilization, Women Humiliation ensues Being in possession of power, men have tried to control women in various ways. As a result, women become the property of men in feudal civilization. The image of humiliation of women has been reflected in the pen of different writers at different times. It is true that the tragic suffering of women is women the best can understand, but the real sensitive man overcomes this obstacle by a long way as evidence, Rammohan's strong struggle against cohabitation or Vidyasagar's steadfast Stand for popularizing widow marriage and introducing Women's education can be mentioned.

In addition to the humiliation of women, the different forms of women, the different forms of women's minds and thoughts have been exposed again and again in the literature of different writers. Needless to say, the way girls appear in the works of female writers inevitably changes the way male writers are seen and shown.

There are many literary works in different languages of different parts of the world Analytical visionary, empathetic 'male' writer's scientific vision has uncovered the complexities of women's minds. At first Rabindranath Tagore in his literature emphasized the importance of female characters to establish dignity against the humiliation of feminity. After Rabindranth, it was Sarat chandra on woman's Psychology, has thoroughly portrayed the eternal emotions of women. He was the first to

dive into the jewels of the female mind and find the bottomless mystery, A part from this, women's Psychology can be found in the literature of Tarashankar Bondhapadhyay, Manik Bondapadhyay, Jagadish Gupta, Premendra Mitra, Subodh Ghosh, Narendranath Mitra, etc. Along with that, the female character has been Well analyzed in the light of Freudian psychology.

Ramapada Chowdhury can be said to be a worthy inheritor of a glorious tradition of Bengali literature the emergence of which in the tumultuous Period of the 40s. In the post- independence period, the deth of countless hopes, economic disaster, the erosion of all Kinds of values have devastated our Society and individual life. All these have direct on indirect effect on him influenced the literature of People's happiness and sadness, laughter and tears, Weakness and protest, as well as walking freely in the alleys of the human mind, especially the female mind. Various unknown information of the conscious and unconscious level of women's mind has been caught in his searching eyes. He has simply recorded the feelings and Psychological tensions that flow like falgu dhara in the subconscious of the female mind. Here is this uniqueness, Every female character in his Story deserves prominence.

Discussion

সমাজে নারীর অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে ফরাসী দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক সিমোন দ্য বোভোয়ারের দি সেকেন্ড সেক্স গ্রন্থের 'কেউ নারী হয়ে জন্ম নেয় না, বরং নারী হয়ে ওঠে' — এই বিখ্যাত মন্তব্যে। বিধাতার এক আশ্চর্য সৃষ্টি এই নারী। যাকে হাজার হাজার বছরের পরম্পরায় বস্তু হিসেবে দেখা হয়েছে। মানুষ হিসেবে নয়। আবহমানকাল নারী শুধু নারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে — মানুষ হয়ে ওঠা থেকে বঞ্চিতই থেকে থেকেছে। রবীন্দ্রনাথের কাছে নারী 'অর্ধেক মানবী' এবং 'অর্ধেক কল্পনা'। এছাড়াও বিভিন্ন বিদগ্ধজনের দৃষ্টিতে নারী স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে অক্ষম। আসলে মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার উচ্ছেদ এবং সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশের ফলেই নারীর অবমাননার সূত্রপাত ঘটে। ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় পুরুষ নানাভাবে নারীকে শৃঙ্খলিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। ফলে সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতায় নারী, পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস-এর মন্তব্য মনে পড়ে —

> "মাতৃতান্ত্রিক অধিকারের উচ্ছেদ স্ত্রী জাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালির কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী। সন্তান সৃষ্টির যন্ত্রমাত্র।"[১]

অধিকার স্খলনের ফলে নারীকে সমাজে নানাভাবে অপমানিত হতে হয়েছে সভ্যতার অগ্রগতির নানা সময়ে। নারীর এই অবমাননার ছবি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহিত্যিকের কলমের আঁচড়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এ-কথা ঠিক যে, নারী-সত্তার মর্মন্তুদ যন্ত্রণা নারীই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারে, তবে প্রকৃত সংবেদনশীল পুরুষ এই বাধা অনেকটা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। প্রমাণ হিসেবে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহনের দৃঢ় সংগ্রাম কিংবা বিধবা-বিবাহ প্রচলন করার জন্য এবং স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন করার লক্ষ্যে বিদ্যাসাগরের অবিচল অবস্থানের কথা বলা যেতে পারে।

নারীর অবমাননার পাশাপাশি নারীর মন ও মননের বিচিত্র রূপ বিভিন্ন সাহিত্যিকের সাহিত্যে উন্মোচিত হয়েছে বারে বারে। বলাই বাহুল্য, মহিলা লেখকদের রচনায় মেয়েরা যেভাবে এসেছে, পুরুষ লেখকদের সৃষ্টিতে দেখা আর দেখানোর ধরন অনিবার্য ভাবে কিছুটা বদলে গেছে। তবে নারীর জীবনে সম্পূর্ণরূপে অবগাহন করতে চাইলে ভরসা একমাত্র নারীর কলম — এই ভাবনার হয়ত খানিক অসম্পূর্ণতাই আছে। প্রথমত, লেখক লেখকই। পুরুষ বা নারী চিহ্নিতকরণ অবৈজ্ঞানিক। দ্বিতীয়ত, বিশ্বের নানাপ্রান্তের নানাভাষার সাহিত্যকর্মের বহু বিশেষণ, দূরদর্শী, সমবেদনশীল 'পুরুষ' লেখকদের বৈজ্ঞানিকদৃষ্টি অবারিত করেছেন নারীর মনের গহণ জটিল ব্যসকূট।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পগুচ্ছে নারী চরিত্র সৃষ্টিতে বহুমুখী কল্পনা ও বিচিত্রগতির অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। জগৎ ও জীবনের চরিত্রগুলি গল্পগুচ্ছে চিত্রিত হয়েছে। তাই বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ বহু বর্ণ-গন্ধে সুশোভিত নারী

চরিত্রের চিত্রশালা। নারীত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে মর্যাদার প্রতিষ্ঠা দিতে তিনি প্রথম নারী চরিত্রের আঁতের কথা টেনে বার করেছিলেন। সমালোচকের কথায়—

> "নারী জগতের ইতিহাস স্তব্ধতার ইতিহাস। এই স্তব্ধতার আড়ালে রয়ে গেছে স্পন্দিত অন্তর্লোক। চিত্রাঙ্গদা, নন্দিনী বা কুমুদিনী, নিরুপমা, মৃণাল বা সোহিনী সেই নিশ্চুপ ভাবলোককে স্পষ্ট কথায় উচ্চারণ করেছে।"[২]

রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎচন্দ্রই নারীর মনস্তত্বকে, নারীর চিরন্তন আবেগকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। একদিকে যেমন স্নেহ, মায়া, মমতা— অন্যদিকে তেমনি ব্যথা-বঞ্চনার অবিচারে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলো স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। এ-প্রসঙ্গে তাঁর রাজলক্ষী, অন্নদাদিদি, চন্দ্রমুখী প্রমুখ চরিত্রের নাম করা যায়। শরৎচন্দ্রই প্রথম নারী-মনের গহনে ডুব দিয়ে অতলান্ত রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, নারীর অন্তর্লোকের অপূর্ব ছবি তাঁর সাহিত্যে অসাধারণ স্পষ্টতায় ফুটে উঠেছে। এছাড়া তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ 'পুরুষ' লেখকের রচনায় নারী-মনের নিগূঢ় রহস্যের সন্ধান মেলে। সেই সঙ্গে ফ্রয়েডিয় মনস্তত্ত্বের আলোকে নারীচরিত্র সুবিশ্লেষিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের এক গৌরবময় ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী বলা যায় রমাপদ চৌধুরীকে। চারের দশকের উত্তাল সময়ের যাঁর আবির্ভাব। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে অজস্র প্রত্যাশার অপমৃত্যু, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সমস্ত রকম মূল্যবোধের অবক্ষয় আমাদের সমাজ ও ব্যক্তিজীবনকে বিধ্বস্ত করে। রমাপদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যুদ্ধোত্তর বাংলাকে দেখছেন। তাঁর গল্পে সমকালের অনেক ঘটনার ছবি মেলে, আমরা আগেই দেখেছি। কিন্তু সমকাল তাঁর গল্পের প্রধান লক্ষ্য নয়। সমাজের বিক্ষোভ ও সংঘাতের পরিবর্তে তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের বহুকৌণিক সম্পর্কের বিন্যাস তুলে ধরেছেন সাহিত্যে। তাঁর সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, সমবেদনার সঙ্গে নির্লিপ্তি তাঁকে বিশিষ্ট মননশীল সাহিত্যিকে পরিণত করেছে। তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ও পক্ষপাত গরীব, অপমানিত, বেদনার্ত, একাকী ও অসফল মানুষের প্রতি। এই মনোভাবে তাঁর গল্পগুলি উষ্ণ, আন্তরিক। তবে তিনি কেবলমাত্র মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভয়-আনন্দ, দুর্বলতা ও প্রতিবাদের চিত্র অঙ্কণ করেই ক্ষান্ত হননি — সেই সঙ্গে মানবমনের বিশেষ করে নারী মনের অলিতে-গলিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন। তাঁর সর্বজ্ঞ সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে নারী মনের চেতন-অচেতন স্তরের নানা অজানা তথ্য।

রমাপদ চৌধুরীর একান্ত নিজস্ব অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান তাঁর ছোটগল্পগুলি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতায় জারিত তাঁর ছোটগল্পের প্রত্যেকটি নারী চরিত্র। শিল্পীসুলভ নৈর্ব্যক্তিকতায়, নিপুণ দক্ষতায় নারীর অবরুদ্ধ কামনা-বাসনা ও তাদের যন্ত্রণার ছবি অঙ্কণ করেছেন তিনি। সহজ-সরল ছোটগল্পগুলিতে মাত্র দু'একটি বাক্যের বিন্যাসে নারীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের গভীরতা আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর গল্পের মেয়েদের মন শান্ত গ্রাম্য নদীর মতন নিস্তরঙ্গ ও সহজ ছন্দে, বহমান কখনো আবার গ্রাম্য নদীর হঠাৎ বাঁক পরিবর্তনের মতোই উচ্ছ্বসিত। তিনি সে-অর্থে জীবনের জটিলতার শিল্পী নন কখনোই। তাঁর গল্পে নারীবাদের উগ্র জেহাদ কখনো ঘোষিত হয়নি। আবার পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি উচ্চকণ্ঠ প্রতিবাদীও নয়। নারী-মনের অবচেতনে ফল্গু ধারার মত বয়ে চলা অনুভূতি ও মনস্তাত্ত্বিক টানপোড়নকে তিনি সহজভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। তাঁর গল্পের প্রতিটি নারী চরিত্র বিশিষ্টতার দাবী রাখে। এরা কেউ তথাকথিত নারীমুক্তির কথা বলে না। বিরাট কোনো বিদ্রোহও করে না। তবে লেখকের নিপুণ বর্ণনায় চকিত আভাসে নারী মনের চোরা গলি-ঘুঁজি যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাঁর সহজ সরল গল্পগুলি শাশ্বত সত্যে সমুজ্জ্বল। প্রত্যেকটি গল্পে নারী চরিত্রগুলির অন্তর্লোক বর্ণিত হয়েছে শিল্পরসের আধারে। শৈল্পিক কুশলতায় তিনি নারী মনের অন্তর্চিত্র উদঘাটন করেছেন। তিনি নিরাবেগ, নিষ্ঠুর স্টোইক শিল্পী নন। আবেগ সমৃদ্ধ, মূল্যবোধ সম্পন্ন শুভ বিশ্বাসী শিল্পী। রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যে মূল মাপকাঠি হল মানবত্ব। তিনি তাঁর গল্পে বিচ্ছিন্নভাবে নারীর নানান রূপাঙ্কণের মধ্য দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন এক সম্পূর্ণ নারীসত্তাকেই যেন গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সারস্বত সাধনার একেবারে সূচনা পর্ব থেকেই রমাপদ চৌধুরীর বেশ কিছু গল্পে নারীর মনোগহণের জটিলতা ধরা পড়েছে। তাঁর জীবনের প্রথমপর্বে রচিত গল্পগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে আছে নারী চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা। তাঁর গল্পের মেয়েরা কোথাও নিজেরাই গল্পের বিষয়বস্তু আবার কোথাও-বা তারাই নিয়ন্ত্রণ করেছে গল্পের গতিপ্রকৃতি।

ধরা যাক, রমাপদ চৌধুরীর প্রথম জীবনে লেখা 'বনবাতাস' (১৩৫২) গল্পটি। এই গল্পের ভরকেন্দ্রে আছে মহুয়া-মিলন লাইম ফ্যাক্টরির অধিশ্বরী বিধবা আরতি দেবী। এই গল্পের আবহে ছড়ানো বনবাতাসের উত্তপ্ত কামনাকে লেখক আরতি দেবীর একাকিত্বে সঞ্চারিত করেছেন এবং তাঁর মনস্তত্ত্বের জটিল বিন্যাসকে ফুটিয়ে তুলেছেন। চোদ্দো বছরের বিবাহিত জীবনের সুখের সংসার মনোতোষ আর আরতি দেবীর। লাইম ফ্যাক্টরির সত্তাধিকারী ছিলেন মনোতোষ। বেশিরভাগ সময় তাঁকে কাজের জন্য বাড়ির বাইরে কাটাতে হতো। উদ্ভিন্ন যৌবনা আরতি দেবীর বিবাহিত জীবনের নির্জন মধ্যাহ্নগুলো তাই স্বামীর প্রথম পক্ষের সন্তান অনুর স্নেহাতিশয্যে সজীব হয়ে উঠত। স্বামীকে সেভাবে পায়নি আরতি দেবী কিন্তু অনুর প্রতি তাঁর মায়া-মমতা ছিল সম্পূর্ণ নির্ভেজাল। তাঁরই তত্ত্বাবধানে, চোদ্দো বছরের সেবা ও যত্নে আট বছরের অনুতোষ বাইশ বছরের পূর্ণ যুবক। আরতি দেবী নিজে সুস্মিতাকে খুঁজে অনুর সঙ্গে বিয়ে দেন। দিনগুলি যখন সুখে ভরপুর, খুশিতে উথলে পড়ছে জীবনের পেয়ালা এমন সময় মনোতোষের মৃত্যু হয়। আরতি দেবী ভাবতেও পারেননি, যে স্বামীর প্রায় কোনো ভূমিকাই ছিল না তাঁর দাম্পত্যে — সেই স্বামীর মৃত্যু এমন অমোঘ হয়ে আসবে তার জীবনে। স্বামীর মৃত্যু তাঁকে নিঃসঙ্গ করে তোলে। যে দোজবর স্বামীকে ভালোবাসতে না পারার জন্য একসময়ে আরতি দেবীর মনে কোনো দুঃখ ছিল না, বরং উপেক্ষায় গর্ব ছিল, সেই স্বামীর মৃত্যু তাঁকে বেপথু করে দেয়। একাকী করে তোলে।

লেখক এ-গল্পে আরতির পতি-প্রেমের কীর্তন করেননি, বরং স্বামীর মৃত্যুতে আরতির একাকিত্বকে দেখাতে চেয়েছেন ফ্রয়েডিয় মনোবিকলনের দর্পণে। এ গল্পে তাঁর একাকিত্ব অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছে। পুত্র অনু ও পুত্রবধূ সুস্মিতার উচ্ছ্বসিত প্রেম তাঁর মনে জ্বালা ধরায়, ঈর্ষান্বিত করে তোলে তাকে। চোখের সামনে অনু ও সুস্মির আমোদে মশগুল হয়ে থাকার দৃশ্য, তাদের ঘনিষ্ঠতা, নিঃসঙ্গ প্রান্তযৌবনা আরতির মনে কামনার বারি সিঞ্চন করে। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' উপন্যাসে মহেন্দ্রর মা রাজলক্ষীর ঈর্ষার কথা আমাদের মনে পড়ে। 'বনবাতাস' গল্পে লেখক আরতি দেবীর মনস্তত্ত্বে ফুটিয়ে তুলেছেন লিবিডো (***libido***)-র রহস্যময় খেলা। সদ্য স্নান সেরে এসে তোয়ালে বুলিয়ে গায়ের জল মুছ্ছিল অনু। —

> "আরতি দেবী দাঁড়িয়ে দেখলেন। আপনা থেকেই তাঁর ঠোঁটের কোণে দুলে উঠল একফালি মিষ্টি হাসি। সম্পূর্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলেন। অনুর সুন্দর দেহ। পেশীবহুল হাত। কাঁধের কাছটা কি মসৃণ। চওড়া বুক আর বিস্তৃত কপালে ক্ষুদকুঁড়োর মত বিন্দু বিন্দু জল। শীকরসিক্ত পুরুষদেহের অপরূপ সৌন্দর্য দেখছিলছিলেন আরতি। মোহময় দৃষ্টি তার চোখে। গর্বের ফল্গু বইছিল তাঁর মনের অন্তরালে।"[৩]

তাঁর অবচেতনে দুলে ওঠে নিষিদ্ধ কামনা। সন্তান স্নেহে বড় করে তোলা অনুকে ঘিরে আজ এই নিঃসঙ্গ মধ্যযৌবনে আরতির মনে তৈরি হয় এক জটিল ব্যাসকূট। সুস্মিকে তিনি হঠাৎ যেন দেখতে থাকেন প্রতিদ্বন্দ্বীর অবস্থানে। এই প্রসঙ্গে সিমন দ্য বোভোয়ার এর উক্তি মনে পড়ে—

> "আত্মপ্রীতি নারীকে করে আত্মকেন্দ্রিক। ...অন্য কোনো নারীর সৌন্দর্য স্বাভাবিকভাবেই তার মনে জাগায় ঈর্ষা। নিজের রূপের গর্বে সাধারণের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে স্বভাবতই সে নিঃসঙ্গ একাকী।"[৪]

আবার স্বামী মনোতোষকে ভালোবাসতে না পারার প্রতিশোধ নিতে আরতি সুস্মি ও অনুর ঘনিষ্ঠতাকে মেনে নিতে পারেন না। যে কোনো প্রকারে মাতৃত্বের কর্তৃত্ব দেখিয়ে তাদের অন্তত একটি রাত্রির মত বিচ্ছিন্ন করতে পারলেও তৃপ্তি অনুভব করেন তিনি। অন্যকে নিপীড়ন করার সুখ, ফ্রয়েডিয় ভাষায় যে Complex বা মানসকূটের নাম Sadism (ধর্মকাম) তাও আমরা দেখতে পাই আরতির মধ্যে। তার আদেশে — 'রাত্রিতে সুস্মি যখন আরতি দেবীর ঘরে শুতে এল, তখন আরতি দেবী দেখলেন সুস্মি আঁচল চাপা দিচ্ছে চোখে। আনন্দ পেলেন, শান্তি অনুভব করলেন আরতি দেবী। জয়ের অভিব্যক্তি ফুটল তার চোখে-মুখে।' আরতি দেবীর এই আচরণে ফ্রয়েডিয় আত্মরতি বা Narcissim-এর নগ্ন বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। বিশিষ্ট দার্শনিক ও প্রাবন্ধিকের মতে—

> "আত্মপ্রীতিময়ী নারী উন্মাদ রোগীর মতো পরনির্ভরশীল। অন্যের সমাজদারিতে সে নিজমূল্য অনুভব করে। বয়স যতই বাড়ে ততই সে জয়াকাঙ্খী হয়। বয়স যতই বাড়ে ততই সে জয়াকাঙ্খী হয় এবং নিজের চারিদিকে

একটা উচ্ছ্বাসময় আবরণ সৃষ্টি করে নিজের লঘুতা ও তমিশ্রা ঢাকতে চায়। কিন্তু সেই উচ্ছ্বাসের আবরণে অবরুদ্ধ হয়ে যে জীবনকে চায় তাকেই হারায়।''[৫]

এই গল্পের শেষে অনু আর সুস্মির উচ্ছ্বসিত দাম্পত্য সংরাগে ঈর্ষান্বিত আরতি দেবী তাদের মধ্যে সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন।'রতিবিলাসকাঙ্খী কৃষ্ণসারিনীর মতো তন্ময় বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আরতি দেবী। দেয়ালের বড় আয়নাটায় নিজের বিস্রস্ত রূপ দেখছেন আর হাসছেন। হাসির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে নেচে নেচে। মাতালের হাসি। উন্মাদের হাসি!' আমরা জানি প্রতিবিম্ব বা দর্পণ নারীর অহংকারের প্রতীক। সে দর্পণের মধ্যে এক জাদু অন্বেষণ করে — যা তার নিজেকে চেনা ও প্রকাশের সহায়ক। নারী মনের এই আত্মপ্রীতি যে অনেকক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশের অভাবে বিবাহিত নারীর জীবনে মর্মান্তিক পরিণতি ঘটাতে পারে তা লেখক রমাপদ এই গল্পে দেখিয়েছেন। আবার বনবাতাসে নেশা ধরানো আমেজের সঙ্গে ফ্রয়েডিয় আত্মরতির উন্মত্ত বাস্তবতার মেলনবন্ধন ঘটিয়েছেন লেখক। বিগত-যৌবনা আরতি দেবীর নবযৌবনের বিকট উল্লাসে মেতে ওঠার দৃশ্য সুন্দর বর্ণনায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

'স্বর্ণমারীচ' (১৩৫৫) গল্পে বাসনার বিচিত্র মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। রত্নপতি বিশ্বনাথ ঘটকের সঙ্গে বিয়ে হয় যুবতী বাসনার। বাসনার জীবনে কোনোকিছুর অভাব থাকে না বিয়ের পর। স্বামী বিশ্বনাথের অতুল ঐশ্বর্য। ক্যাডিলাক গাড়ি, অজস্র দামি গয়না, বিরাট বাড়ি সবই আছে। শুধু নেই শরীরী প্রেমের উত্তাপ। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বাসনাকে সুখী করার জন্য বিশ্বনাথের প্রাণপণ প্রচেষ্টা। নিজের অক্ষমতা ঢাকতে, বাসনাকে খুশি করতে হিরের কণ্ঠহারটা পরিয়ে দেয় বাসনার গলায়। বাসনা খুশি হয়। স্বামীর দুর্বলতায় মায়া হয় তার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, 'স্বামীকে সুখী করবে মনপ্রাণ দিয়ে। সতর্ক থাকবে যাতে কোনোরকম আঘাত না দিয়ে ফেলে স্বামীর দুর্বলতার স্থানে।'— বাসনাকে সুখী করার অপিসীম চেষ্টা করে বিশ্বনাথ। কিন্তু বাসনা সুখী হতে পারেনি। বিশ্বনাথের কিনে আনা শাড়ি গয়নায় নিজেকে সুন্দর করে সাজায় বাসনা। আয়নায় নিজের রূপ দেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। বিশ্বনাথের অক্ষমতা সন্দেহে পরিণত হয় একসময়। স্বামী সন্দেহ দুর্বল মনের কথা ভেবে দুঃখের হাসি হাসে বাসনা। ব্যথিত বাসনা অতীত দিনের স্বপ্নমন্থন করে। উপেক্ষা করে আসা প্রেমিকের প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে তার। অন্তর ব্যথায় ভরে যায়। তাই 'অন্ধকূপের নিপীড়ন অসহ্য ঠেকে। না, নিশ্চিদ্র সিন্দুকের রত্নহার হয়ে থাকতে পারবে না বাসনা।' আবার কল্পনায় ডুবে যায় বাসনা।

> ''প্রোষিত দয়িতের কল্পিত দুঃখের কথা ভেবে ভারাক্রান্ত মন লঘু হয়ে আসে বাসনার। আত্মনিপীড়নে অদ্ভুত এক আনন্দ পায়। ... কৃপা আর করুণার মানদণ্ডে নিজেকে যাচাই করে। কল্পনায় দীর্ঘায়িত করে তাদের বিস্মৃত বিশ্রম্ভালাপ। চোখে জল আসে, মনে আসে শান্তি।''[৬]

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কলেজ-পড়া এক তরুণের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় বাসনার। 'তারপর দিনে-দিনে লিপির দৌত্যে পরিচয় হল প্রগাঢ়। এল আমন্ত্রণ। এসেছে সুযোগ।' নারকীয় পাতালপুরীর বন্দিজীবনকে ত্যাগ করতে চায় বাসনা। জীর্ণ বস্ত্রের মত স্বামী বিশ্বনাথকে পরিত্যাগ করে চলে যতে চায় দয়িতের সঙ্গে।--আগামী অজস্র সুখ আর খুশিয়াল অনন্ত মূহূর্তের স্বপ্ন চঞ্চল করে তোলে বাসনাকে। ঘুমন্ত স্বামীর পাশ থেকে উঠে পড়ে বাসনা, অজানার আহ্বানে অভিসার যাত্রা শুরু করতে। নিঝুম অন্ধকারে যাত্রা শুরুর আগে তার অজস্র বসন, ভূষণ, রত্নালঙ্কারের কিছু সে সঙ্গে নিতে চায়। ধীরে ধীরে সাজঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালে বাসনা। পরমূহূর্তে চোখ ঝলসে যায় তার। সেসময় হঠাৎ বাতাসের বুক চিরে শিস বেজে ওঠে— আহ্বান সংকেত। কিন্ত এত ঐশ্বর্যের জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে যায় বাসনার। মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। বিস্ফারিত চোখে দেওয়ালের চারপাশের আয়নাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। নিজেকে আরো একবার আবিষ্কারের চেষ্টা করে। দামি শাড়িগুলোর স্পর্শ নেয় বাসনা। ত্বরিত হাতে খুলে ফেলে তার ভাঁজ, মেলে ধরে উজ্জ্বল আলোকের সামনে। তৃষাতুর চোখের দৃষ্টি দিয়ে রস আহরণ করে। এরপর 'কাঁচের আলমারিটার দিকে ফিরে ফিরে তাকায় বাসনা। উন্মাদনা নেচে ওঠে তার সুরাক্ত শোণিতে। অজস্র রত্নালঙ্কারের উজ্জ্বল ঝলসানি। আইভরির হাঁসুলি, প্ল্যাটিনামের দুল। হীরের কণ্ঠহার, মুক্তোর সিঁথিমউড়, প্রবালের মালা, সোনার কঙ্কণ।' এত ঐশ্বর্য তার? এসবের একক সম্রাজ্ঞী সে? এ কথা ভাবতে ভাবতে 'বাসনার মনে হয়, এক গোপন সুড়ঙ্গ পথের কপাট খুলেছে,

আর চোখের সামনে ঝলসে উঠেছে প্রবাল, প্ল্যাটিনাম, হীরে-জহরত, মণি-মুক্তা, চন্দ্রহারের হাট। ভোরের সূর্যের মতো! শারদ রামধনুর মতো ফুটে পড়ছে অপূর্ব রং আর রত্নের সমাবেশ।' — এর একটা কানাকড়িও ফেলে যেতে ইচ্ছা হয় না বাসনার। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে বাসনা। মাথা ঝিমঝিম করে তার। আবার শিস বেজে ওঠে। কিন্তু –

> "বাসনা তখনও বিমূঢ় স্থির। না, না এসব ফেলে যেতে পারবে না সে। আবার এসব ফেলে — যেতে পারবে না।"[৭]

যে বাসনা শরীরী প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় দয়িতের সঙ্গে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল, ঐশ্বর্য্যের জৌলুসে তার মনোভাবে আসে হঠাৎ পরিবর্তন। চোখ ঝলসানো স্বর্ণমারীচ মায়াকুহক রচনা করে বাসনার মনে। তাই এই ঐশ্বর্যের সুখ ফেলে শেষ পর্যন্ত দয়িতের সঙ্গে চলে যেতে পারে না বাসনা। এতদিনের কাঙ্ক্ষিত আহ্বানকে উপেক্ষা করে ঐশ্বর্যভাণ্ডারের লোভে।

এবার রমাপদর 'জ্বালাহর' (১৩৫৬) গল্পটিকে দেখা যাক। এই গল্পে দুই বোন শ্যামলী ও শিউলির বিপরীত দাম্পত্যের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। মদ্যপ স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে বোন শ্যামলীকে রক্ষা করতে দিদি শিউলি এক আশ্চর্য ছলনার পথ বেছে নেয়। লেখক সহজ নৈপুণ্যে শিউলির মনস্তত্ত্বের জটিল বিন্যাসকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

শ্যামলীর স্বামী ইন্দ্রনাথ চাকরি সূত্রে বদলি হয়ে আসে শিউলিদের বাড়ির কাছাকাছি। কোথাও থাকার জায়গা না পেয়ে শিউলি ও তার স্বামী সুরঞ্জনের অনুরোধে বোন শ্যামলী ও ভগ্নিপতি তাদের বাড়িতেই থাকে। দিনের আলোয় শ্যামলী আর ইন্দ্রনাথের হাসাহাসি, হই-হল্লা শোনা যায়। তাদের সুখী দম্পতি বলে মনে হয়। কিন্তু 'এ মিঠে মিতালির আয়ু সূর্যমুখী ফুলের মতই দিনাবদ্ধ। শেষ রোদ্দুরের সঙ্গে সঙ্গেই উবে যায় শ্যামলীর সুখের শিশির।' সূর্য নিভলেই নেশায় ডুবে যায় ইন্দ্রনাথ। অনেক রাতে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে প্রহার করে শ্যামলীকে। নিষ্ঠুর অত্যাচার পীড়নে শ্যামলী তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে। তার আর্তকণ্ঠের চিৎকারে ব্যথিত হয় শিউলি। ইন্দ্রনাথকে বোঝাতে এসে শিউলি বলে— এত রাত করে বাড়ি ফেরো কেন? ... আপিসের ছুটির পরেই বাড়ি ফিরলে তো পারো।' আরো বলে — 'মেয়েরাও মানুষ ইন্দ্র। স্বামীর কাছে একটু মায়া অন্তত তারা আশা করে। তুমি শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, আমি আর কি বলব।' — শিউলির অনুরোধের স্বর ইন্দ্রনাথের হৃদয় স্পর্শ করে, আত্মধিক্কারের লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকলেও কোনো পরিবর্তন হয় না তার। রাতে মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে শ্যামলীকে বেত মারে। শ্যামলী যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলে বলে—'চুপ হারামজাদী। দিদির কাছে গিয়ে লাগাবি আর? ... আমি নেশা করি? মারধোর করি?' শিউলি শুনতে পায়। অনুশোচনা হয় শ্যামলীর উপকার করতে গিয়ে যেন অপকার করেছে সে! আদরের ছোটো বোন শ্যামলীকে ইন্দ্রনাথের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচাতে শিউলি এক আশ্চর্য ছলনার আশ্রয় নেয়। ইন্দ্রনাথ মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে যে মূহূর্তে শ্যামলীকে প্রহারে উদ্যত হয় সেই মূহূর্তে ওরা শুনতে পায় শিউলির ভীতিবহুল কণ্ঠের কান্নাভরা চিৎকার। 'শুধু সেই দিন নয় প্রতিদিন।' শ্যামলী ও ইন্দ্রনাথ ভাবে শিউলির স্বামী সুরঞ্জন শিউলিকে প্রহার করে প্রতিদিন। শিউলির আর্তকণ্ঠের চিৎকারে তাই 'মায়া হয়। বেদনা বোধ করে ইন্দ্রনাথ শিউলির জন্যে। আর সুরঞ্জনের উপর ক্রোধ।' শিউলির লাঞ্ছনা, আর ব্যথাহত কণ্ঠের চিৎকার—বদলে দেয় ইন্দ্রনাথের জীবন। 'বিকেলে আপিসের ছুটির পরই ফিরে আসে আসে ইন্দ্রনাথ। সারা সন্ধ্যাটা শ্যামলীর সঙ্গে গল্প করে। টুকিটাকি সাহায্য করে শ্যামলীকে, তার কাজে... শ্যামলীকে টেনে বসায় নিজের কাছে। কখনো-বা ওর হাত থেকে এটা-ওটা কেড়ে নিয়ে চটিয়ে তোলে। শ্যামলী খুব খুশি। হঠাৎ যেনওর মনে হয়, ও নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে।' কিন্তু প্রতিদিন দিদি শিউলির চিৎকারটা বড়ো অসহায় করে তোলে শ্যামলীকে। 'ঠিক ওদের সেউ পুরানো জীবনটাই যেন শিউলিকে ছুঁয়েছে।' শ্যামলী মনে মনে ঠিক, জামাইবাবু 'সুরঞ্জনকে ও বাধা দেবে। অত্যাচার নিজে সহ্য করে এসেছে ও এতদিন তাই জানে ব্যথাটা কোথায়।' পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে শিউলির ঘরের দিকে পা বাড়াতেই শুনতে পেল শিউলির চিৎকার। 'ছুটে গিয়ে জানালায় উঁকি দিল দিল শ্যামলী। পরমূহূর্তে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল ও। দেখল খিলখিল করে হাসছে শিউলি। হঠাৎ কানে গেল শ্যামলীর— সুরঞ্জন বলছে, কি ছেলেমানুষি করো! শিউলি হেসে উত্তর দিল, শ্যামলী ত সান্তনা পায়।[৮]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-20
Website: https://tirj.org.in, Page No. 170-183
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মদ্যপ স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে বোন শ্যামলীকে বাঁচাতে শিউলি মিথ্যে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে। উপদেশে অনুরোধে যা হয়নি। তার আর্তকণ্ঠের চিৎকারে তা হয়েছে। ইন্দ্রনাথকে বদলে দিয়েছে। শ্যামলী ও ইন্দ্রনাথের সংসারে সুস্থতা এনে দিয়েছে শিউলির এই অভিনব পন্থা।

'বাসুকি বসুন্ধরা' (১৩৫৭) গল্পে নারীর আর এক রহস্যময়ী রূপ ফুতে উঠেছে। এই গল্পের অনুরাধার সহেলি বা সই ছিল ছেলেবেলায়, কোনো এক 'চন্ননদা'—চন্দনদা। তারপর জীবনপ্রবাহের নিজস্ব নিয়মে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নতার পর কংসাবতীর মায়াঘেরা উপনিবেশ ছেড়ে হঠাৎ দেখা তাদেরশহর কলকাতার ভিড়ে। পুনর্মিলনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর অনুরাধার আবদার,

> ''লেখো না তুমি, আমাকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে পারো না?' সত্যিই জীবনটা তার 'রীতিমতো উপন্যাস'! ছেলেবেলার সেই আধা-শহরে বদলি হয়ে এসেছিলেন ওভারসিয়ার— তারই ছেলে 'যমকালো, যমের মতো কালো নয়নমণি। ভারি ভালো তার গানের গলা— বাঁশির সুর। অনুরাধা লুকিয়ে শুনত সেই গান, শিখত বাঁশি বাজানো। আবার ঠাট্টা করে বলতও, নয়ন দা, তুমি বুঝি আলকাতরার কারখানায় কাজ করতে? শেষমেশ এই কালোমানিকের সঙ্গেই ঘর ছাড়ল — ঘর বাঁধল অনুরাধা। আর ঘর বাঁধার পরেই মনে হল তার, গান বাঁশি — সব খ্যাতির জন্যে'। কিন্তু রূপ বা সৌন্দর্য না থাকলে ভালোবাসা যায় না।''[৯]

টাইপ শিখল অনুরাধা। কোলের ছেলেটা মরল যখন—আবার উধাও হল সে। রুজির টানে। শহর কলকাতায়। ছিন্নমূল সেই মেয়েটি এবার বিয়ে করল অফিসের এক অবাঙালি সহকর্মীকে—মি. আয়ার। আর এসব শুনে ছেলেবেলার 'সহেলি' বা 'সই' 'চন্ননদার' মনে হল, এ মেয়ের জীবনকথা নিয়ে কেমন করে উপন্যাস হয়? এ যে অপন্যাস! তবে কৈশোরের মুগ্ধ বন্ধুত্বের টানে একদিন গিয়েই পড়ল অনুরাধার বাড়ি। আবিষ্কার করল প্যারালিসিসে আক্রান্ত তার দ্বিতীয় স্বামীকে। কৃষ্ণকান্ত আয়ারকে কত যত্নেই না রেখেছে অনুরাধা! সেলাই শেখায়, অফিস করে, গান শেখায়—পঙ্গু স্বামীকে অকৃপণ সেবা করে সহাস্যে। তার ফাঁকেই ছেলেবালার সইকে জানায়, 'নয়নদা যাদবপুরে আছে, হাসপাতালে। টিবিতে ভুগছে। ... যাও না একদিন, দেখা করে এসো। পুরানো লোক দেখলে একটু শান্তি পাবে হয়তো।' তাকেও যেতে বললে বিব্রত উত্তর—'না না ছিঃ ভালো দেখায় না, উচিতও নয়।' চন্দন তখনো বোঝেনি অনুরাধার গভীর অতল ভালোবাসার স্বরূপ। গেল একদিন কৈশোরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়নমণিকে দেখতে। আর আবিষ্কৃত হল অন্য এক অনুরাধা। নয়নমনি জানাল, কেমন করে টিবি ধরা পড়ার পরেই অনুরাধা রোজগারের আশায় নিরুদ্দেশ হল। কেমন করে এতদিন চালিয়ে এসেছে রাজরোগের সমস্ত খরচা। আর চন্দনের মনে পড়ল, এই অনুরাধাই কিনা বলেছিল, 'রূপ বা সৌন্দর্য না থাকলে ভালোবাসা যায় না?' গল্প শেষে চন্দন জানতে চায়, কাকে ভালোবাসে অনুরাধা। নয়নমণি না কৃষ্ণকান্ত। নাকি দুজনকেই?' খিলখিল করে হেসে উঠে চন্দনকে অনুরাধা জানায়—যদি বলি তোমাকে? চন্দন বলে— 'তাহলে নয়নমণিকে সারিয়ে তোলার জন্যে রক্ত জল করতে না প্যারালিটিক কৃষ্ণকান্তের সংসারেও মায়া থাকত না তোমার।' অনুরাধা এর কোনো উত্তর দিতে পারে না। চকিতে একবার তাকায় চন্দনের মুখের দিকে। কান্না গোপন করতে চলে যায় চা তৈরি করতে। ফিরে এলে, চন্দন আবিষ্কার করে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে এসেছে অনুরাধা। চন্দন বুঝতে পারে তার গোপন ভালোবাসার অব্যক্ত বেদনা।

গল্পনামে মিথ-এর অনুষঙ্গ পাই। পুরাণে আছে সর্পশ্রেষ্ঠ বাসুকি এই পৃথিবীকে ধরে রেখেছে। আর এই গল্পের অনুরাধা যেন বাসুকির মতো ধরে রেখেছে নয়নমণি আর কৃষ্ণকান্তের পৃথিবী।

অনুরাধা নয়নমণির শিল্পীসত্তাকে ভালোবেসেছিল। আর মি. আয়ারের সৌন্দর্য বা রূপ। এই দুই স্বামীর কাছে অনুরাধা পরিপূর্ণ সুখ বা ভালোবাসা পায় নি। কিন্তু এই দুই অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা ও সেবা করেছে অকৃপণ ভাবে। দুই স্বামীর প্রতি কর্তব্যে সে অবিচল। তার এই মনোভাবে উন্মোচিত হয়েছে নারী মনের জটিল ব্যাসকুট।

'নারী-পুরুষের সম্পর্ক' এবং 'প্রেম'— এ দুটি বিষয় নিয়ে রমাপদ বার বার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। একটি পুরুষ ও একটি নারীর মধ্যে প্রেমের চিরাচরিত ধারণা বদলে দিয়ে তিনি দেখালেন একটি মেয়ে। একই সঙ্গে দুজন পুরুষকে ভালোবাসতে পারে। দায়িত্ব নিতে পারে। আবার স্পষ্টভাবে নিজের ভালোবাসার কথা জানাতে পারে।

নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে রমাপদ বেশ কিছু গল্প লিখেছেন। প্রেমকে কেন্দ্র করে নর-নারীর আশ্চর্য মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। প্রেম সম্পর্কে তিনি বরাবরই একটি বিশেষ 'থিয়োরি'তে আস্থা রেখেছেন। 'জনৈক নায়কের জন্মান্তর' (১৩৭৪) উপন্যাসের ভূমিকায় তিনি বলেছেন—

> "প্রেম একটি গভীর অনুভূতি, তাই প্রেমের কোনো কাহিনী হ'তে পারে না। প্রেম একটি বিশুদ্ধ যন্ত্রণা, কিন্তু তার বহতা ধারার সঙ্গে মিশে থাকে ঈর্ষা, স্বপ্ন, ক্ষুদ্রতা ও সন্দেহ, স্বার্থ ও লোভ।"[১০]

প্রেমকে ঘিরে নারীর বিচিত্র রূপ ও মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'তিতির কান্নার মাঠ' (১৩৫৮) গল্পে। এই গল্পটিকে 'শেষপর্যন্ত পুরোদস্তুর মনস্তাত্ত্বিক গল্প'[১১] বলে উল্লেখ করেছেন অধ্যাপিকা শম্পা চৌধুরী। এই গল্পের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে হালকা কুয়াশার মতো এক আশ্চর্য লিরিক সৌন্দর্য। আর সেই সঙ্গে রয়েছে এমনই এক করুণাঘন আর্তি যা পাঠকের মনে বেদনার সুর হয়ে বাজে। প্রেমকে ঘিরে গল্পের নায়িকা অরুণিমা সান্যালের বিচিত্র মনোভাবের ছবি লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পে। এই গল্পের কথক 'আমি' ওরফে সুনীতদা। গোটা গল্পটি বর্ণিত হয়েছে ভবিষ্যৎ কালে। আর সেই ভবিষ্যতেরই হাত ধরে তা পিছিয়ে গেছে ফেলে আসা অতীতে। সুনীত, অরুণিমা আর অসীমেন্দু-র কলেজ জীবনে। হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টের মেয়ে অরুণিমা সান্যালকে সুনীত ও অসীমেন্দু দুজনেই ভালোবাসত। কিন্তু অরুণিমা সুনীতের ভালোবাসা প্রত্যাখ্যান করে অসীমেন্দুকেই গ্রহণ করে। বহুদিন পর সুনীত লাইন ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়। এদিক অরুণিমাকে ভালোবাসার অপরাধে অসীমেন্দু বঞ্চিত হয় তার উত্তরাধিকার থেকে। দারিদ্র্য আর হতাশায় দিন কাটে তার। তবু ওদের ভালোবাসায় ভাঙন ধরেনি এতটুকু। বরং জীবন পেয়েছে। বেকার অসীমেন্দু অরুণিমাকে সুখে রাখতে চেয়েছিল। এছাড়া দারিদ্র্য আর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের উপহাস থেকে বাঁচতে সুনীতকে ডেকে বলে— 'লাইম ফ্যাক্টরির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তুই। তোর এখন কত প্রতিপত্তি, একটা ব্যবস্থা তুই করে দে সুনীত। যে কোনও একটা চাকরি, তুই চেষ্টা করলেই হবে, আমি ঠিক জানি। আমাকে শুধু এখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে দে সুনীত। আমি আর অরুণি যেমন করে হোক চালিয়ে নেব, শুধু আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের উপহাস থেকে আমাকে বাঁচা তুই।' সুনীত অসীমেন্দুর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেয়। চাকরিতে যোগ দিয়েই অনেক স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল অসীমেন্দু। সমস্ত কিছু ঠিক করে অসীমেন্দু অরুণিমাকে আনতে গেল। কিন্তু দেখা গেল অরুণিমা এল না। অসীমেন্দু একাই ফিরল। এর কয়েকদিন পর ডিনামাইট ফাটিয়ে চুনের চাঙড় খসাবার সময় অ্যাকসিডেন্টে মারা যায় অসীমেন্দু। যা আসলে সুইসাইড।

এত পরিকল্পনা, এত দুর্বার প্রেম থাকা সত্ত্বেও অরুণিমা অসীমেন্দুকে ফিরিয়ে দেয়। কারণ একদা প্রত্যাখ্যাত সুনীতের সহায়তায় অসীমেন্দুর চাকরি অরুণিমার ব্যক্তিত্বকে আহত করে। তার কথায়—

> "মেয়েরা যাকে প্রত্যাখ্যান করে তারই দয়ায় বেঁচে থাকার চেয়ে বড়ো লজ্জা যে তাদের নেই সুনীতদা।"[১২]

বিয়ের প্রাক্ মুহূর্তে অরুণিমার না-আসার সিদ্ধান্ত অর্থাৎ তার মনোভাবের পরিবর্তনে দুঃখে, হতাশায় অসীমেন্দু আত্মহত্যা করে। বহুদিন পরে স্বাস্থ্যোদ্ধারে এসে অরুণিমার দেখা হয় সুনীতদার সঙ্গে। বিগত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে তারা বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সুনীত আবিষ্কার করে স্বামী সন্তান থাকা সত্ত্বেও অরুণিমার অন্তর বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। '...স্বামীর উজ্জ্বল সোহাগের আড়ালে ফুটফুটে একটি ছোট্ট শিশুর হাসি আদরের নীচে, আনন্দ আর উদ্দাম প্রগলভতার অন্তরে একটি ব্যর্থ পরাজিত তিতির শুধুই কাঁদছে। সারা দিনরাত নিঃশব্দে কেঁদে চলেছে।' সুনীতের কাছে আপাত সুখী অরুণিমার ক্ষয় রোগে ধীরে ধীরে মৃত্যুপথযাত্রী হওয়া যেন মৃত্যু নয়, আত্মনিঃশেষ। ব্যক্তিত্বময়ী অরুণিমার মনোভাবের পরিবর্তনে যেমন অসীমেন্দু আত্মহত্যা করেছে তেমনি শেষ পর্যন্ত অরুণিমাও বিষাদ প্রতিমায় পরিণত হয়েছে। অন্তর বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন।

ফ্রয়েডিয় মনোবিকলন তত্ত্বের আলোকে আর একটি অনন্য সাধারণ গল্প লিখেছেন রমাপদ চৌধুরী 'খুনী বউ' (১৩৬০)। গল্প কথক 'আমি'-র দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। নিভা আর রতনচাঁদের সুখের সংসার। কিন্তু একটি মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল রতনচাঁদের, ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রেম, প্রেম থেকে প্রবৃত্তি। তারপর হঠাৎ কলঙ্কের বিভীষিকা দেখেছিল রতনচাঁদ। সেই কলঙ্ক অপসারণের স্থূল পথের সাহায্য নিতে গিয়েই কিনা কে জানে, মৃত্যু ঘটে

মেয়েটির।'- এমন একটি নৃশংস ইতিহাসের নায়ক রতনচাঁদ। অভিযুক্ত খুনী রতনচাঁদ গ্রেফতার হয়। সকলেই জানে রতনচাঁদের শাস্তি নিশ্চিত ফাঁসি। তার স্ত্রী নিভা স্বামীকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাতে সর্বস্ব বাজি রাখে। দুশ্চিন্তার প্রতীক্ষায় দিনে দিনে ক্রমশই রোগা হতে থাকেন নিভাদি। শুধু কি তাই? 'রতনচাঁদকে বাঁচাবার জন্যে নিজের বাচবার মতনও কিছু অবশিষ্ট রাখলেন না নিভাদি।' নিভাদির বাবা মেয়ের সিথির সিঁদুর বজায় রাখবার জন্য বিষয়সম্পত্তির সব বিক্রি করে দিলেন। শুধু বিষয়সম্পত্তিই নয়, নিভাদির হাতের চুড়ি ও গলার হারও চলে যায়। প্রচুর খরচখরচা, অক্লান্ত প্রচেষ্টা আর উকিলের বুদ্ধির প্যাঁচে সন্দেহের অবকাশে খালাস পেয়ে যায় রতনচাঁদ। কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে রতনচাদ যেদিন বাড়ি ফিরে আসে, তার পরদিনই শোনা যায়, সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। নিভাদি নাকি পাগল হয়ে গেছেন, কী সব আবোলতাবোল বকছেন— এই খবর শুনে গল্পকথক দেখা করতে যান নিভাদির সঙ্গে। বোবা চোখ মেলে কথকের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বললেন,

"ক্ষমা? ক্ষমা করতে হবে? জানো, দুশ্চরিত্র পুরুষ আমার দুচক্ষের বিষ। হ্যাঁ। বিষ, বিষ।"[১৩]

খিলখিল করে আবার উন্মাদের মতো হেসে ওঠে নিভাদি। আর তার বিষের মতো নীল এক জোড়া চোখে হাসি দেখে ভয় পেলেন গল্পকথক।

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নিভার দু'চক্ষের বিষ তার স্বামীকে সে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে। তার নারীত্বের প্রতি অপমানের প্রতিশোধ নিতে এই পন্থা অবলম্বন করেছে সে। যে স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে তার এত চেষ্টা, এত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাকে সেই স্বামীকে ফিরে পেয়ে আনন্দে নিশি যাপন না করে বিষ প্রয়োগ করেছে। যেন সে এই দিনটার অপেক্ষাতেই ছিল। তার এই মানসিক পরিবর্তন নারী মনস্তত্ত্বের এক বিচিত্র প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক-এর কথা মনে পড়ে—

> "নারী তার প্রেমিকের সমস্ত দোষ-ত্রুটি অক্ষমতা তার ভালোবাসার দ্বারা পূরণ করে নিতে পারে, এমন কি ভালোবেসে তার সমস্ত বিশ্বাস ও আদর্শকেও গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সে প্রেমিকের নীচতা ক্ষমা করতে পারে না।"[১৪]

নিভাও তাই পারে না তার স্বামীর নীচতাকে ক্ষমা করতে। তার স্বামীর চারিত্রিক স্খলনের চরম শাস্তি নিজের হাতে দিতে অনেক কষ্টে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচিয়েছে। আর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রতনচাঁদ বাড়ি ফিরলেই পরদিন বিষ প্রয়োগে হত্যা করে নিভাদি। দাম্পত্য সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবের ফলে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে ব্যক্তির মূল্যবোধজনিত সংকট গভীর হয়েছে। আধুনিক নাগরিক জীবনচেতনার প্রতিফলন ঘটেছে এ গল্পে।

এই গল্পের অনুষঙ্গে আমাদের মনে পড়ে সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষের 'মা হিংসী' গল্পটির কথা। এই গল্পে দেখা যায় মানুষের চরম অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড দানের বিরুদ্ধে মানবতার আবেদন। এই গল্পে গিরধারী প্রতিবেশী শনিচারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার প্রস্তাবে শনিচারী রাজি হয়নি তাই প্রতিহিংসাবশে গিরিধারী তাকে হত্যা করে। হত্যার দায়ে বিচারে আসামী গিরিধারীর ফাঁসির আদেশ হয়। তার ফাঁকিকে কেন্দ্র করে অমানবিক প্রহসন চলতে থাকে। বীভৎস মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে ও গিরিধারীর শান্ত মৃত্যু ঘটাতে তার স্ত্রী রাধিয়া বিষ মেশানো খাবার খাওয়াতে চেয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

'রাঙা পিসীমা' (১৩৬০) গল্পের ভরকেন্দ্রে আছে রাঙা পিসিমা। পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল রাঙা পিসিমার। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে তার স্বামী হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও স্বামীর সন্ধান পান নি তিনি। আঠারো বছর বয়স থেকে স্বামীর অপেক্ষা করতে করতে প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁছেছেন রাঙা পিসীমা। দীর্ঘ দিন পরে হঠাৎ একদিন রাঙা পিসীমার স্বামী ফিরে আসেন। কিন্তু বাড়ির আর সকলে তাক চিনতে পারলেও রাঙা পিসীমা তার স্বামীকে চিনতে পারলেন না। গেরুয়াধারী প্রায় বৃদ্ধ মানুষটিকে তিনি স্বামী হিসেবে মেনে নিতে পারেন না। তাই স্বামী ফিরে আসার পরদিনই গঙ্গা স্নানে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান রাঙা পিসীমা।

আসলে রাঙা পিসীমা যাকে মনের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছেন তিনি কোনো গেরুয়াধারী প্রৌঢ় মানুষ নন— একুশ-বাইশ বছরের সুদর্শন যুবক। তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত স্বামীর সঙ্গে ফিরে আসা স্বামীর। কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পান না। তাকে মেনে নিতে পারেন না স্বামী বলে। তাই তো তিনি গঙ্গাস্নানে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এখানেই গল্পটি একটি আলাদা মাত্রা পায়। চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার বৈপরীত্যে রাঙা। পিসীমার মনের পরিবর্তন তাই তার অন্তর্জগৎকে উন্মোচিত করে। রাঙা পিসীমার কথায়,

> "যার কথা সারাজীবন ভেবেছি, যার খোঁজে সারা জীবন কেটে গেছে, সে যদি সত্যিই একদিন এসে হাজির হয় একেবারে অন্য চেহারা নিয়ে, সত্যিই যদি ফিরে আসে, সে যে কি অসহ্য তোরা বুঝবি না, তোরা বুঝবি না। ওরে, আজ বুঝতে পেরেছি, তার কথা ভাবতে চাই তাকে চাই না আর।"[১৫]

তরুণ প্রজন্মের নারী-পুরুষ সম্পর্কের অন্তহীন রহস্যকে অনায়াস দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন রমাপদ তাঁর রচনায়। স্বাধীনতা-উত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সর্বব্যাপী বেকার সমস্যা, নবীন-প্রবীণে দুস্তর ব্যবধান, সর্বোপরি সমস্ত রকম মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জীবনে বেঁচে থাকার মানে খুঁজাতে চায় যে প্রজন্ম- সেই ক্ষতবিক্ষত নবীন প্রজন্মের সার্বিক বিভ্রান্তির ছবি রমাপদ তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে বিপর্যস্ত তরুণ তরুণীর মনস্তাত্ত্বিক অবস্থানের যথার্থ স্বরূপটি প্রস্ফুটিত করেছেন। একটি সাক্ষাৎকারে আমাদের সমাজে নারী-পুরুষ সম্পর্ক নিয়ে রমাপদ চৌধুরী বলেছেন—

> "আমাদের দেশে মেয়েদের স্থান যে জায়গায় থাকা উচিত ছিল, তার ধারেকাছেও পৌঁছতে পারে না। সেখানে পৌঁছনোর আগে নারী-পুরুষ সম্পর্ক যা হওয়া উচিত তা হতে পারে না। সুতরাং আমাকে প্রধানত ভাবায় নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা।"[১৬]

পরিবর্তমান যুগ-মানসিকতার বিশ্বস্ত ছাপ রমাপদর রচনার পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তাঁর রচনায় বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে মেয়েদের ভূমিকা। সমস্ত রকম ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা তথা সামাজিক প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে তারাই হয়ে ওঠে নতুন মুখের ধাত্রী, নতুন মূল্যবোধের ধারক ও বাহক। যুক্তিপ্রয়াসী, স্বচ্ছবুদ্ধি, ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলা নতুন প্রজন্মের এই মেয়েদের আমরা দেখতে পাই তাঁর 'এখনই' ও 'পিকনিক' উপন্যাসে। নবীন প্রজন্মের কলেজে পড়া তরুণ তরুণীর সহজ মেলামেশা ও বন্ধুত্বের ছবি রমাপদ-র এই দুই উপন্যাসের উপজীব্য।

রমাপদ চৌধুরীর 'আড়াল' গল্পটিতে তরুণ প্রজন্মের দুই তরুণীর মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ছবি ফুটে উঠেছে একদা কলেজের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু সুজাতার সঙ্গে অনেকদিন পর দেখা হয় ইন্দ্রাণীর। কিন্তু বিগত দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে আগের মতো আনন্দ পায় না তারা। আগের মতো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না সুজাতা। ইন্দ্রাণী তার ব্যর্থ প্রেমের কাহিনিতে নস্টালজিক হয়ে পড়লে সযত্নে এড়িয়ে যায় সুজাতা। সে ইন্দ্রাণীকে বলে, 'সুকুমারকে তুই ভুলে যা ইন্দু।' অথচ ইন্দ্রাণী চলে যেতেই সেই সুকুমারের সঙ্গে গোপন অভিসারে বেরিয়ে পড়ে সুজাতা। এই গল্পে লেখক দুটি তরুণী হৃদয়ের অন্তর্লোকের রহস্যকে তুলে ধরেছেন সুন্দর ভাবে। ইন্দ্রাণী তার ব্যর্থ প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে বেদনাহত হয়ে পড়ে। তবু সে বার বার স্মৃতির পাতা উল্টে রোমন্থন করে, ফেলে আসা অতীতের কথা। সে ব্যথার আত্মনিপীড়ন থেকে কি এক অদ্ভুত উদগ্র খুশীর আমেজ পায় ইন্দ্রাণী।' সুকুমারের প্রসঙ্গে কোনো কথা বললেই অস্বস্তি বোধ করে সুজাতা, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এড়িয়ে যেতে চায়। কোনো ভাবেই ইন্দ্রাণী, সুজাতার কাছে তার গোপন ব্যথা প্রকাশ করে একাত্ম হতে পারে না। ইন্দ্রাণী অনুভব করে— 'সুজাতা বদলে গেছে। দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতি ওদের অতীত বন্ধুত্বকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আর নয়। সুকুমারের কথা আর তুলবে না ইন্দ্রাণী। সুজাতার চোখে ওর প্রেমের মূল্য আজ নিঃশেষ হয়ে গেছে।[১৭] ইন্দ্রাণীর যেন মনে হয় সুজাতার কাছে ওর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় নয়। 'সুজাতা যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে ওর কাছ থেকে রেহাই পাবার জন্যে। ইন্দ্রাণী আর অপেক্ষা না করে বিদায় নেয়। এরপরই আমরা দেখি সুজাতার মনোভাবের পরিবর্তন। যে সুজাতা সুকুমারের সম্পর্কে ইন্দ্রাণীকে বলে— 'সুকুমার? কি জানি, পরীক্ষার পর এই তো এক বছর কেটে গেল। দেখা হয় নি আর। কার কাছে যেন শুনলাম সেদিন, ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে।' সেই

সুজাতা ইন্দ্রাণীকে বিদায় দিয়েই সুকুমারের সঙ্গে গোপন অভিসারে যায়। এই গল্পের শেষে আর এক ঝলক মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করি সুজাতার। ইন্দ্রাণীর চলে যাওয়াতে খুশি হয় সুজাতা। তার পর নিজেকে সুসজ্জিত করে বেরিয়ে পড়ে গোপন অভিসারে। সুকুমার অর্থাৎ দয়িতের কাছে ইন্দ্রাণীর কথা বলতে গিয়েও সযত্নে নিজেকে সামলে নেয় সুজাতা গোপন করে। ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা। আর তার এই আচরণে উন্মোচিত হয় চিরন্তনী নারীর অন্তর্লোক।

এবার দেখা যাক 'দুটি বোন' (১৩৬৪) গল্পটি। এই গল্পটিকে অধ্যাপিকা শম্পা চৌধুরী পুরোপুরি 'মনস্তাত্ত্বিক গল্প'[১৮] বলে উল্লেখ করেছেন। এই গল্পটি গড়ে উঠেছে রত্নার বিচিত্র মনোভাবকে অবলম্বন করে। এই গল্পের নায়িকা রত্না বিয়ের দিন সন্ধ্যায় পালিয়ে যায় প্রেমিক তিমিরের কাছে। কিন্তু প্রেমিক তিমিরের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে আবার বাড়ি ফিরতে হয় তাকে। এই সময়ের মধ্যে পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে রত্নার জন্য মনোনীত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় তার ছোটোবোন রানীর। রত্না যেন বাড়িতে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে যায়। তাকে বাদ দিয়ে সমস্ত আলোচনা চলে। ক্রমশ একটা অস্বস্তিবোধ রত্নাকে ঘিরে ধরে। কিন্তু বোনের অষ্টমঙ্গলার দিন একটু যেন মনের জড়তা কেটে যায়। 'বুকের দুরু দুরু অস্বস্তি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে সকলের পেছনে সেও এসে দাঁড়াল সদর দরজায়।' বোন আর বোনের বর সুশান্তকে দেখে পরম পরিতৃপ্তিতে মন ভরে ওঠে রত্নার। সুশান্তর সঙ্গে আলাপ হয় রত্নার। কিন্তু বোন রানীর মুখে অনর্গল শ্বশুরবাড়ির প্রশংসা শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায় রত্নার। বোনের সৌভাগ্য ও গর্বে ঈর্ষান্বিত রত্নার বিচিত্র মনোভাব প্রকাশ পায়। রত্না মনে মনে বলে— 'এত গর্ব, এত গুণগান করে কার? ওর কি একবারও মনে হয় না, এ সবই রত্নার দান। ইচ্ছে করলে রত্না সবকিছুই কেড়ে নিতে পারে।' রত্না আবিষ্কার করে 'তার হাসি, তার কথা রঙ ধরায়, নেশা ধরায় সুশান্তর মনে। কয়েকদিনের মধ্যেই রত্না সুশান্তর চোখের ভাষা পড়তে পারে। রত্নাও এক বিচিত্র কৌতুকে মেতে ওঠে। সুশান্তর চোখে রঙ লাগাতে বড়ো ভালো লাগে তার। সুশান্তর চাপা মনের দুর্বলতাটা দেখতে বেশ মজা লাগে।' ধীরে ধীরে রত্নার মনেও রঙ লাগে। সুশান্তর মোহময় দৃষ্টি আর হাসি নেশা ধরায় তার মনে। সুশান্ত চলে গেলে নিজেকে বড়ো নিঃসঙ্গ মনে হয় রত্নার। সুশান্তর আগমন তার কাছে 'অপূর্ব রোমাঞ্চের মতো। গ্রীষ্মের দুপুরে সরু গলির থমথমে গরমে আচমকা এক দমকা ঠান্ডা বাতাসের মতো স্নিগ্ধ অনুভূতি।' রত্নার বঞ্চিত যৌবন বন্দনা করে সুশান্তকে।

> "সুশান্তকে ঘিরেই রোমাঞ্চ বুনেছে রত্না। কাছে এগিয়ে গিয়েও ফিরে এসেছে। ফিরে এসেও দূরে থাকতে পারেনি। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। বিচিত্র দুর্বলতা। রত্না বুঝতে পারে, অনুভব করে। সুশান্তকে সে ভালোবাসে। সে ভালোবাসা গভীর আর অকৃত্রিম। সে ভালোবাসা রঙিন মধুর। তবু তিমিরের কথা মনে পড়লেই বুকের কোণে একটা স্মৃতির কাঁটা যন্ত্রণা দেয়। রত্না বুঝতে পারে পারে এ ভালোবাসা অন্য কিছু, এ প্রেম অন্য প্রেম।"[১৯]

রত্নার 'এক একসময় ইচ্ছা হয় ও নিজেই এগিয়ে যাবে সুশান্তর কাছে। কী এক অবোধ্য আকর্ষণ। অথচ কি এক অসীম অন্যায় বোধ।' ছোটো বোন রানীর কথা যতবার মনে পড়েছে ততবারই পিছিয়ে এসেছে রত্না। 'এ এক অদ্ভুত কামনা, দূরে থাকতে চায় রত্না, তবু ভুলতে চা না সেই মধুর আবেশ।' রত্নার দ্বন্দ্ব জটিল রূপে ফুটে উঠেছে এখানে। সুশান্তর প্রতি অব্যক্ত প্রেম আর বোন রানীর প্রতি প্রীতি এই টানাপোড়েনে বিলসিত হয় রত্নার জীবন। আগুন জ্বালিয়ে পোড়াতে চায় সুখের সংসার, রানী এসে জল ঢালে তাতে। আগুন, জলের মধ্যে প্রতিনিয়ত এই যুদ্ধে সুপ্ত থাকে নারীমনের জটিল ব্যাসকূট। গল্পের বর্ণনাভঙ্গি আর সংলাপে সুপ্ত থাকে নারীমনের চিরকেলে জট-জটিলতা। নিজের মনকে সংযত করতে তাই 'সুশান্ত আর রানীর দাম্পত্য প্রেমের খুঁটিনাটির মধ্যে শান্ত আনন্দ উপভোগ করে রত্না। সুশান্ত আর রানীর সুখস্বপ্ন যেন ওর মনেও খুশির ভাব এনে দেয়।' এক একসময় নিঃসঙ্গ রত্নার মনে হয় তিমিরের কাছে ফিরে গেলে হয়তো তার নিঃসঙ্গতা কাটতে পারে। তার অলস জীবনটার নিঃস্বতা চাপা দেওয়ার জন্য একটা চাকরি নেয় রত্না। তবু নিঃসঙ্গতা কাটে না তার। এমন বা পাঁচ বছর পর তিমিরের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলেও রত্নার মনে

অতীত আবেগ ফিরে আসে না। তার গতানুগতিক জীবনে বোন রানী, রানীর স্বামী সুশান্ত আর তাদের শিশুপুত্রের সঙ্গে একটু সময় কাটাতে ভালো লাগে রত্নার। তার নিঃসঙ্গ জীবনে এরাই নিয়ে আসে এক ঝলক খুশির হাওয়া।

'নতুন চশমা' (১৩৬৬) গল্পে প্রেমকে কেন্দ্র করে নারীমনের দুর্জের রহস্য ফুটে উঠেছে। এই গল্পে লেখক স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে মানুষের হৃদয়হীনতা, প্রবঞ্চনা, স্বার্থবোধ ও মানসিকতার পরিবর্তনকে এঁকেছেন। ছলনাময়ী নারীর মানসিকতার জটিল বিন্যাস ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। এক সময়ের প্রেমিকা লহনার সঙ্গে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে দেখা হয় কথক 'আমি'র। লহনা উচ্ছল উচ্ছ্বাসে আলোড়ন তোলে কথকের হৃদয়ে। লহনা সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে পুরোনো প্রেমের স্মৃতি মনে করে কথকের কাছে। বিবাহিতা লহনা রহস্যজাল বিস্তার করে নিজের চারিদিকে। গভীর আবেশে ছলছল চোখে করে বলে— 'এখনই বললে না, সেদিন তোমার কোনও হাত ছিল না। আজ আছে? আছে সেই সাহস? চলো এখনই এই মূহুর্তে যেখানে খুশি তুমি আমাকে নিয়ে চলো। অপবাদকে আমি ভয় পাই না, দারিদ্রকে ভয় পাই না। যাবে নিয়ে যাবে আমাকে?' লহনার এই কথায় কথক 'আমি'র সমস্ত শরীর কি এক নেশায়, কি এক লুব্ধ আবেগে কেঁপে ওঠে। একটু পরে লহনা আবার ছলনাময়ীতে পরিণত হয় বিয়েবাড়িতে ছুটে বেড়ায় কর্মব্যস্তের মতো, 'এর গায়ে ঢলে পড়ছে, ওকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে, এর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কথা বলছে, খিলখিল করে হেসে উঠছে অন্য কারও কথায়। প্রতিটি পুরুষের সঙ্গে সেই একই ব্যবহার।' আবার একবার এসে লহনা কথক 'আমি'কে তার বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানায়, যৌবনের নেশা জড়ানো চোখে তাকিয়ে। লহনার রহস্যময় ব্যবহার তখন তার রক্তে বিষাক্ত একটা নেশা ধরিয়ে দিয়ে যায়। কথক আমির কথায়, 'যাকে আজীবন কামনা করেছিলাম, যাকে হারিয়ে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে মনে হয়েছিল, সে যদি উপযাচিকা হয়ে এসে দাঁড়ায় শুধু হৃদয় দুয়ারে নয়, দেহের দেহলীতে, তা হলে উপেক্ষা করা যায় না।' কয়েকদিন পরে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে কথক চলে যায় লহনার বাড়ি। কিন্তু কথক 'আমি'কে দেখেই লহনার দুচোখে যেন বিরক্তি ফুটে ওঠে। চেষ্টা করেও সেটুকু লুকোতে পারে না লহনা। বিভিন্ন কাজর অজুহাতে বার বার সে দূরে সরে থাকে। লহনার কথায় যেন ছদ্ম ভদ্রতার ছাপ থাকলেও আন্তরিকতার ছাপ ছিল না। বিয়ে বাড়িতে লহনার বেশবাস একটু দৃষ্টিকটু লাগলেও 'আমি' আবিষ্কার করে বাড়িতে তার সংযত বেশবাস। 'মাথার ঘোমটাটা একটুও খসেনি, হাতের কনুইটাও যেন সযত্নে আঁচলে ঢাকা। আর মুখে না হাসি, না প্রগলভতা।' সম্পূর্ণ সংযত ব্যবহার করে লহনা। পূর্বের কথার সূত্রপাতেই সমাপতন ঘটায় সে। আত্মগ্লানি অনুভব করে কথক 'আমি'। সেই সঙ্গে লহনার ব্যবহারে পরিবর্তন দেখে বিস্মিত, ব্যথিত ও আশাহত হয়ে চলে যায় কথক 'আমি'। বেশ কিছুদূর গিয়ে মনে পড়ে চশমাটা ফেলে এসেছে। ভুলে ফেলে আসা চশমাটা নিতে গিয়ে বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনতে পায়— লহনা তার স্বামী নিখিলেশকে বলে—

> "কি নির্লজ্জ দেখো, বাড়ি বয়ে দেখা করতে এসেছে। ও কি ভাবে জানো?... ও ভাবে আমি ওকে ভালোবাসি— ভালোবাসতাম। পুরুষ জাতটা যে কি বোকা হয়।"[২০]

কথক 'আমি' লজ্জায়, অপমানে—ফেলে আসা চশমাটা না নিয়েই চলে আসে।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রেমে পুষ্পিত পেলবতা ও উজ্জ্বলতা বা প্রত্যাশার পরিবর্তে যে ঊষরতা, হতাশা ও স্বার্থবোধ দেখা দিয়েছিল এ গল্পে সেটাই তুলে ধরেছেন লেখক। ছলনাময়ী নারীর প্রবঞ্চনা ও চূড়ান্ত স্বার্থবোধ এই গল্পে ফুটে উঠেছে। আমরা বুঝতে পারি এই গল্পের লহনার কাছে প্রেমের গভীরতা কত কম। শুধু পুরোনো প্রেমিকের হৃদয়ে প্রথম প্রেমের রোমাঞ্চ জাগায় তার নিপুণ অভিনয় আর ছলনায়। কিন্তু সে প্রেমের অনুভব তার মধ্যে ছিল না। পরে তার ব্যবহারে হৃদয়হীনতা প্রকাশ পায়। প্রেমিকের আবেগ নিয়ে সে কৌতুক অনুভব করে। তার দুর্বলতায় লহনা খুশি হয়। নিজের সুবিধামতো লহনা তাকে প্রবঞ্চিত করে। তার ব্যবহারের পরিবর্তনে চূড়ান্ত স্বার্থবোধ প্রকাশ পায়।

'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া' (১৩৬৭) গল্পে নারীমনের মানসিকতার ভয়াবহ পরিবর্তন দেখিয়েছেন রমাপদ চৌধুরী। মানুষের মধ্যবিত্তসুলভ স্বার্থবোধ নগ্নভাবে প্রকাশ করেছেন একটি মেয়ের মধ্যে দিয়ে। এই গল্পের কথক 'আমি' একটি মেয়ে। যার সদ্য বিয়ে হয়েছে গৌতমের সঙ্গে। গৌতমের স্ত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে 'আগাগোড়া' গল্পটি বর্ণিত হয়েছে। নব বিবাহিত দম্পতি বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে যায় পুরীতে। নবপরিণীতা স্ত্রীর কাছে বীরত্ব

প্রকাশ করতে নুলিয়া ছাড়াই স্নান করে গৌতম। স্বামীকে ডুবে যেতে দেখে মেয়েটি একটি নুলিয়াকে হাতের বালাজোড়া দিয়ে অনুরোধ করে স্বামীকে বাঁচাতে। মাতাল, সমুদ্রের মধ্যে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে নুলিয়াটি উদ্ধার করে গৌতমকে। স্বামীকে ফিরে পেয়ে মেয়েটির মনে দ্বিধা তৈরি হয়। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় নুলিয়াকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি স্বাভাবিক অবস্থায় সে মেনে নিতে পারে না। মেয়েটির মনে হয় এই বালা দুটো নিয়ে কিই বা করবে ও? ওর কাছে এ বালা দুটোও যা দুগাছি চুড়িও তাই। ... চুড়ি দুটোর দামই বা কম কি? আর বালা দুটো ওকে দিয়ে দিলে মা বকবে না তো! বড়ো জা?... তার চেয়ে এক জোড়া চুড়িই বরং দেওয়া যাবে নুলিয়াটিকে, ওর বউকে পরাতে বলব।' সময় যত অতিবাহিত হয়েছে, তার প্রতিশ্রুতির গাঢ়তাও ফিকে হয়েছে। বিয়ের পর দিদি উপদেশ দিয়েছিল— শত অভাব-অনটন সত্ত্বেও গয়নাগুলো নষ্ট না করতে। তাই নুলিয়াকে চুড়ি না দিয়ে বরং একটা আংটি দেওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু বাড়ি ফেরার জন্য তাড়াহুড়ো করে গোছগাছ করতে গিয়ে নুলিয়ার কথা ভুলে যায়। শেষ পর্যন্ত চলে আসার সময় নুলিয়ার হাতে এক টাকা দিয়ে সে কর্তব্য শেষ করে কলকাতায় ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে এসে জা-কে বলে, 'নুলিয়ারা সমুদ্রে চান করাতে দু আনা করে নেয়, আমি আসবার সময় কিন্তু একটি টাকাই বকশিশ দিয়ে এসেছি।' এরপর মনে মনে নিজের আচরণের সমর্থনে যুক্তি খাড়া করে।

> "সত্যিই কি বালা দুটো দেব বলেছিলাম নুলিয়াটাকে? বোধ হয় না। সে সময় আমার কি মাথার ঠিক ছিল? কি বলেছি, কি করেছি তা কি আর আমিই জানি। না, বালা-টালার কথা নিশ্চয়ই বলিনি। তাছাড়া আমার বলা-কওয়ার জন্যে কি অপেক্ষা করে ছিল নাকি নুলিয়াটা কখনো না। আমি বলার আগেই হয়তো নুলিয়াটা দেখতে পেয়েছিল। দেখতে পেয়েই সমুদ্রে ঝাপিয়ে পড়েছিল। কেউ ডুবে গেলে তাকে বাঁচানো তো ওদের কাজ।"[২১]

এই গল্পে একটি মেয়ের মানসিকতার ভয়াবহ পরিবর্তন দেখিয়েছেন লেখক। সেই সঙ্গে একটি মেয়ের মধ্যে দিয়ে মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক স্ববিরোধ ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে—

> "মধ্যবিত্ত মানসিকতার অভ্রান্ত বিশ্লেষণ, তার ইতরতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, মিথ্যাচার, সব কিছু এখানে লেখকের নির্মম লেখনীমুখে উদ্ঘাটিত হয়েছে।"[২২]

লেখক এই গল্পে নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের বাহ্যিক উজ্জ্বল্যের আড়ালে অন্তঃসারশূন্য অগভীরতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় তুলে ধরেছেন। একটি মেয়ের মধ্যবিত্ত সুলভ মানসিকতার পরিবর্তন দেখিয়েছেন তিনি। নুলিয়া তার স্বামীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলার পর নিজের প্রতিশ্রুতি থেকে মেয়েটি একটু একটু করে সরে দাঁড়ায়। তার মধ্যে দেখা দেয় মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন, দ্বন্দ্ব জটিল মনে খুঁজতে থাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি। শেষ পর্যন্ত স্বার্থবুদ্ধির আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় মানবিক সত্তা। এই গল্পে রমাপদ তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও কল্পনা শক্তির মিশ্রণে এক অকথিত জীবনের স্বরূপ বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়—

> "কিন্তু আমি তো জীবনের মুখোমুখি দাঁড়াতে চেষ্টা করেছি। শুধুমাত্র মৃত্তিকাগঞ্জের জীবন নয়, যে জীবন আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত, যে জীবন বাইরের জগতের সঙ্গে এক হাতে, নিজের আত্মবিরোধের সঙ্গে আরেক হাতে অবিরল পাঞ্জা লড়ে চলেছে, আমি তারই ভাষ্যকার হতে চেয়েছি।"[২৩]

বলাবাহুল্য, এই জীবনের রূপদানে তিনি সফল হয়েছেন। জীবনের নানা পর্বে তিনি সাধারণ মানুষকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তাদের খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয়গুলি অভিজ্ঞ ও সন্ধানী দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি। গভীর মননে সংবেদনশীল লেখক অনুভব করেছেন তাদের জীবন-স্পন্দন। বঞ্চিত জীবনের প্রতি তাঁর নিঃসীম করুণা ও সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। সেই সঙ্গে চৈতন্যের গভীরে প্রোথিত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট করে তুলেছেন তাদের জীবনসত্যকে। তাঁর প্রতিটি ছোটোগল্প তাই সংবেদনশীলতা ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের শিল্পময় সংশ্লেষ। গভীর অনুভূতি ও মননই তাঁর উপাসনা। রমাপদ চৌধুরীর প্রতিটি গল্পের কাহিনি শেষ হয়ে গেলেও কাহিনিগত অবশেষ ফুরোয় না। সংগীতের সুরের মতো রেশ রেখে যায় পাঠকের মনে।

Reference :

১. 'The Origin of the Family, Private and the State', Frederick Engels, Progress Publishers, Moscow, 1977, p. 57-58

২. রায়, বিশাখা, 'রবীন্দ্রনাটকে নারীভাবনা', কলকাতা, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৭

৩. চৌধুরী, রমাপদ, 'বনবাতাস', গল্পসমগ্র, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ. ২৩

৪. 'The Second Sex' Simmone De Beauvoir. Translated by Constance Borde and Shiela Malovany Chevailier, Vintage Books, London, 2011. p. 544-545

৫. Ibid. p. 641-652

৬. চৌধুরী, রমাপদ, 'স্বর্ণমারীচ', 'গল্পসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ. ৮৭

৭. তদেব, পৃ. ২০

৮. চৌধুরী, রমাপদ, 'জ্বালাহর', 'গল্পসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ. ১১৭

৯. চৌধুরী, রমাপদ, বাসুকি বসুন্ধরা, গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ.১৪০

১০. চৌধুরী, রমাপদ, 'জনৈক নায়কের জন্মান্তর', কলকাতা, ডি.এম. লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ, ১৩৭৯, সূচনা পৃষ্ঠা

১১. চৌধুরী, শম্পা, 'রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প', কলকাতা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৩১

১২. চৌধুরী, রমাপদ, 'তিতির কান্নার মাঠ', 'গল্পসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ. ১৭৮

১৩. চৌধুরী, রমাপদ, 'খুনী বউ', 'গল্পসমগ্র', আনন্দ পাবলিশাস, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ. ২৪৬

১৪. সিংহরায়, গোপীমোহন, 'রবীন্দ্রসাহিত্যে নরনারী', কলকাতা, ভারবি, পুনর্মুদ্রণ মে ২০১০, পৃ. ১৬২

১৫. চৌধুরী, রমাপদ, 'রাঙা পিসীমা', 'গল্পসমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ. ২৮৩

১৬. 'সমকালীন বাংলা উপন্যাস', কয়েকটি প্রশ্ন, এক আলোচনাচক্র উপলক্ষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সাহিত্যিকের সাক্ষাৎ সংবলিত পুস্তিকা, ১৯৮৯, পৃ. ৬১

১৭. চৌধুরী, রমাপদ, 'আড়াল', 'গল্পসমগ্র', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ. ৭২৭

১৮. চৌধুরী, শম্পা, 'রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প', কলকাতা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৬৯

১৯. চৌধুরী, রমাপদ, 'দুটি বোন', 'গল্পসমগ্র', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২১০, পৃ. ৭৪৯

২০. চৌধুরী, রমাপদ, 'নতুন চশমা', 'গল্পসমগ্র', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ. ৩৪৪

২১. চৌধুরী, রমাপদ, 'আমি, আমার স্বামী ও একটি নুলিয়া', 'গল্পসমগ্র', কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, তৃতীয় মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ. ৪০৬

২২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সংস্করণ এপ্রিল, পৃ. ৩৯২

২৩. চৌধুরী, রমাপদ, 'গদ্য সংগ্রহ', কলকাতা, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৫২